ইমাম কাযেম (আ.)

মূল লেখক : মূল : দার রাহে হাক প্রকাশনীর লেখকবৃন্দ

ভাষান্তরে : মোঃ মাঈন উদ্দিন তালুকদার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

যখন গোধূলী লগ্নে সুউচ্চ খোরমা- শাখে মৃদু সমীরণের কোমল স্পর্শ আপাদমস্তক আন্দোলিত হয়ে কানাকানি করে তখন তোমারই নির্মল জীবনের বীরত্ব গাঁথা চুপিসারে গেঁয়ে যায় । আর তোমার উপর যে অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়েছে তার শোক গাঁথা আলতো হাওয়ায় ছড়িয়ে দেয়।

হৃদয় ভারাক্রান্ত বাসন্তী আকাশের মেঘপুঞ্জ যখন অশ্রুবারি বিসর্জন করে নীলীমের দ্বারগুলো উম্মুক্ত করে দেয়, তখন তোমার আহত হৃদয় অনুসারীরাই যুগ- যুগান্তরে ইতিহাসের বিস্তীর্ণ কপল আঁখিজলে সিক্ত করেছে ।

অশ্রুর স্থূল অবগুন্ঠন, তোমার প্রতিবাদ প্রতিরোধ, ও পরিণামে আত্মবিসর্জনের বীরত্ব গাঁথা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে না । আর যদি তোমার নিমত্ত আঁখিজল বিসর্জন দিয়ে থাকি, তবে তা হবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যাতে তোমার প্রতিরোধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি । আর সেই সাথে বিশ্ব ও ইতিহাসের পাতায় তোমার বীরত্বের স্মরণে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি । আমাদের হৃদয় পটের সুন্দরতম ও বীরত্বপূর্ণ স্থান থেকে তোমার জন্য থাকবে নির্মল ও নিষ্কলুষ অভিনন্দন ও পবিত্রতম দরূদ - সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় ।

আবওয়া[১] নামক গাঁয়ের পরিবেশ ঐ দিন প্রভাতেই যেন কিছুটা অন্য রকম ছিল । সূর্য রশ্মি সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ কোমর পর্যন্ত সোনালী আভায় মুড়িয়ে দিয়েছিল । আর তাদের প্রলম্বিত ছায়াগুলো ঐ গাঁয়ের পুষ্পিত ছাউনির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল... ।

রাখালদের সাথে চলমান উষ্ট্রগুলোর কণ্ঠ ধ্বনি ও মেষদলের শোর গোল ছাপিয়ে ভোরের পাখিরা, আনন্দ ও প্রভাতী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছিল । আর জীবন সঙ্গীতে কর্ণকুহর হয়েছিল পরিপূর্ণ ।

গাঁয়ের পাশে নির্মল জলাধার ও সুমিষ্ট পেয় জল সরেবরে অদ্য প্রশান্ত বাতাসের মৃদু স্পর্শে কিঞ্চিত তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল । গাঁয়ের রমণীকুল এ জলাধার থেকেই মশক পূর্ণ করত । কয়েকটি আবাবিল হতবিহবল হয়ে নির্মল সরোবরের উপর দিয়ে এদিকে সেদিক ছুটোছুটি করছিল; আর

কিছুক্ষণ অন্তর স্বীয় রক্তিম বক্ষ জলাধারে সিক্ত করছিল যেন আমুল ফিলের (হস্তী বছরে আবরাহার বাহিনীর উপর নিক্ষি) ঐ কংকরের উত্তাপ তখনও উপলব্ধি করছিল । একটু দূরে একমাত্র খোরমা বৃক্ষের সবুজ ও সুউচ্চ ত্রিকোণ ছায়ার আশ্রয়ে একটি সমাধি । এ সমাধির উপর ঐ দিন প্রাতে এক রমণী আনত ভঙ্গিতে সশ্রদ্ধ চুম্বন এঁকে যাচ্ছিলেন । আর অস্ফুট সূরে ক্রন্দনরত ... আর ওষ্ঠাধারে কি এক অভিব্যক্তি যেন ধ্বনিত হচ্ছিল । মৃদু সমীরণে তার সে ধ্বনি ভেসে আসছিল, যেন সে ধ্বনিতে এ কথা শুনা যাচ্ছিল :

হে আমিনা! তোমার প্রতি দরুদ । হে নবী (সা.)- এর সম্মানিতা মাতা! মহান আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা ও রহমত বর্ষণ করুন, (যে তুমি স্বীয় জন্মভূমি থেকে দূরে মৃত্যুবরণ করেছিলে) ।

এখন আমি তোমার পুত্রবধু; তোমার বংশধর গণের মধ্য থেকে এক শিশু আমার গর্ভে বিদ্যমান, গত নিশী থেকে যে বেদনা আমি অনুভব করছি, তাতে মনে হয় আজই হয়ত এ পবিত্র শিশু এ গাঁয়ে তোমারই সমাধির পাশে ভূমিষ্ঠ হবে ... ।

আহ! ওহে মহতী, যে তুমি সমাধিতে শুয়ে; আমার পতি আমাকে বলেছেন যে, আমার এ সন্তান আপনার পুত্র মহানবী (সা.)- এর স ম উত্তরাধিকারী হবেন ।

হে আমার সম্রাজ্ঞী! মহান আল্লাহর কাছে আমার জন্য চাও যাতে এ সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় জন্ম দান করতে পারি... । ভোরের রবি তখন সমাধির উপর বেড়ে উঠা একমাত্র বৃক্ষের শাখা থেকে নিচে নেমে এসে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল... ।

হামিদাহ ধীরে- সুস্থে উঠে দাঁড়ালেন, তার পরিধেয় সমাধির পবিত্র ধুলি- স্পর্শে যে ধূলিত হয়েছিল, তা হাওয়ার ছড়িয়ে দিলেন, এক হাত পেটের উপর রেখে অন্তঃসত্তা রমণীরূপ ধীর, সতর্ক ও সাবধানতার সাথে গাঁয়ে ফিরে যেতে লাগলেন ।

পরক্ষণে সূর্য যখন আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে এসে দাঁড়াল গায়ের পাখীরা তার জ্যোতির ঝর্ণা ধারায় আবওয়ার নির্মল নীলাকাশে পাখাগুলো ধৌত করছিল । আনন্দ ধ্বনি গায়ের নিভৃত কোন থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল ... । আর আমার অনুভূতি নির্মল জলা ধারের কিনারা থেকে

অবলোকন করছিল যে, রমণীগণ গাঁয়ের লতানো পথ বেয়ে দ্রুত বিহ্বল হৃদয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছিল ... ।

তখন দু'রমণী একই ভঙ্গিতে জলাধারের দিকে বৃহদাকার মৃৎপাত্র হস্তে জল বইয়ে নিতে আসছিল. ।

আমার অনুভূতি নতুন সংবাদ শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করছিল... । ভগ্নি! বললেন ইমাম সাদিক (আ.) । অতঃপর নবজাতক সন্তানের জন্মের সংবাদ শ্রবণান্তে বললেন : "আমার পর যে পথ প্রদর্শক হবে, মহান আল্লাহর সে উৎকৃষ্টতম বান্দা জন্ম গ্রহণ করল ।"[২]

ওহে শোননি তাঁর নাম কি রাখা হয়েছে? সম্ভবত তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'মূসা ।'

এ গাঁয়ে কি ঘটেছে আমি জানিনা । তবে অবচেতন মনের কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, জলাধারের পাশে, প্রান্তরে এক রাখাল তাঁর যষ্ঠি দিয়ে মেষ পালকে সম্মুখপানে তাড়া করছে.. । মুহূর্তের জন্য আমার স্মৃতিপটে তরঙ্গায়িত হলো ঐ রাখাল সেই মূসা, আর ওখানে সিনা প্রান্তর । কল্পনার আকাশ থেকে অবতরণ করত দেখত পেলাম এ মূসাতো সেই নবজাতক; তবে সে কোন ফেরাউনের প্রতিকূলে এ ধরাধামে পদার্পণ করেছে...?!

ইমাম ও আব্বাসীয় শাসন

ইমাম মূসা ইবনে জা'ফর কাযেম (আ.)- এর চার বছর বয়সের সময় স্বেচ্ছাচারী উমাইয়্যা শাসনের মূলোৎপাটিত হয়েছিল ।

উমাইয়্যা শাসকদের আরবীয়করণ নীতি, অন্যায় অত্যাচার, লুন্ঠন প্রক্রিয়া ইরান বিরোধী শাসন ব্যবস্থা জনগণ, বিশেষ করে ইরানীরা যারা প্রকৃত ইসলামী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আশা করত, বিশেষ করে যারা ইমাম আলী (আ.)- এর স্বল্পকালীন খেলাফত আমলের শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি আশা করত তারা উমাইয়্যা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন । এমতাবস্থায় তদানিন্তন রাজনীতিবিদরা মানুষের এ প্রবণতাকে বিশেষ করে ইরানীদের হযরত আলীর বংশধর ও আলীরূপ শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের আকর্ষণকে অপব্যবহার করেছিল । তারা যার অধিকার তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নামে, আবু মুসলিম খোরাসানীর সহযোগিতায় উমাইয়্যাদেরকে পদচ্যুত করালেন । কিন্তু তারা ষষ্ঠ ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.)- এর পরিবর্তে আবুল আব্বাস সাফফাহ আব্বাসীকে খেলাফতের মসনদে এবং প্রকৃত পক্ষে রাজ সিংহাসনে বসালেন ।[৩]

এভাবেই ১২৩ হিঃ সনে রাজতন্ত্রের এক নব ধারার পত্তন ঘটল, তবে তা খেলাফত ও নবী (সা.)- এর উত্তরসূরীর পোশাকে তারা ধর্মহীনতা, অত্যাচার ও কপটতার দিক থেকে উমাইয়্যাদের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না, বরং এগুলোর দিক থেকে তারা উমাইয়্যাদেরকেও হার মানিয়েছিল ।

পার্থক্য শুধু এটুকু যে উমাইয়াদের কু- শাসন খুব বেশী স্থায়ী হতে পারেনি । আর আব্বাসীয়রা ৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ ৫২৪ বছর একইভাবে বাগদাদ থেকে খেলাফতের নামে রাজত্ব করেছিল ।

যাহোক, স ম ইমাম তাঁর জীবদ্দশায় আবুল আব্বাস আস সাফফাহ, মানসূর দাওয়ানিকী, হাদী, মাহদী ও হারুনের খেলাফতামল তাদের সকল অত্যাচার, মানহানি ও বল প্রয়োগের ঘটনাপঞ্জী সহ অতিবাহিত করেছিলেন ।

ইমামের জীবন দর্পন, দুঃখের তাম্রমলে ঢেকে দেয়ার কিংবা বেদনার অমানিশায় আচ্ছাদিত করার জন্য কেবলমাত্র এ শয়তান প্রকৃতির মানুষগুলোর দুষ্ট ও নিষ্ঠুর আত্মার কলুষতাই যথেষ্ট ছিল । অথচ এদের প্রত্যেকেই (মানসূর থেকে হারুন পর্যন্ত) এ মহাত্মনের দেহ ও মনের উপর চরম নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট অত্যাচার চালাতে কুন্ঠাবোধ করেনি । যদি কিছু না করে থাকে তবে তা অপারগতা বশত, করতে চায় নি যে, তা নয় ।

আবুল আব্বাস আস সাফফাহ ১৩৬ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে তার ভ্রাতা মানসূর দাওয়ানিকী তার স্থলাভিষিক্ত হলো । সে বাগদাদ নগরী গড়ল এবং আবু মুসলিমকে হত্যা করল । যদোবধি খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলো হযরত আলীর সন্তানগণকে হত্যা কারারুদ্ধ ও নির্যাতন করা এবং তাদের ধনসম্পদ লুট- তরাজ করা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত হয়নি । সে এ বংশের সকল মহান ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেছিল । আর তাদের শীর্ষে ছিলেন ইমাম সাদেক (আ.) ।

হারুন ছিল রক্তপিপাসু, প্রতারক, চরম হিংসুক, কৃপণ, লোভী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী । আবু মুসলিমের ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা সাধারণের কাছে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল । কারণ সে এক জীবন কষ্টের বিনিময়ে তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল ।

যখন, ইমাম কাযেম (আ.)- এর মহান পিতাকে শহীদ করা হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর । তিনি তাঁর জীবনের ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানসূরের ভয়- ভীতি, ত্রাস ও শ্বাসরুদ্ধকর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য গোপনে সংবাদ প্রেরণ করতেন ও তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন ।

মানসূর ১৫৮ হিজরীতে নিহত হলে রাজ সিংহাসনের দায়িত্ব ভার তার পুত্র মাহদীর উপর ন্যস্ত হলো । মাহদী আব্বাসীর রাজনীতি ছিল প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক ।

সে তার পিতার শাসনামলের রাজবন্দীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সকলকেই মুক্তি দিয়েছিল, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইমাম কাযিমের অনুসারী । সে তাদের লুন্ঠিত মালামালও ফিরিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু তাদের কাজ কর্মের প্রতি নজর রেখেছিল এবং অন্তরে তীব্র ক্ষোভ গোপন রেখেছিল । এমনকি যে সকল কবিরা হযরত আলীর বংশকে দুর্নাম করত, তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দিত । যেমন : একবার বাশার ইবনে বুরদকে সত্তর হাজার দেরহাম দিয়েছিল এবং মারওয়ান ইবনে আবি হাফসকে একলক্ষ দেরহাম দিয়েছিল ।

মুসলমানদের বাইতুলমালের টাকা তার আরাম, আয়েশ, মদপান ও নারীর পিছনে উদার হস্তে খরচ করত । সে তার পুত্র হারুনের বিবাহে পঞ্চাশ মিলিয়ন দেরহাম খরচ করেছিল ।

মাহদী আব্বাসীর সময় ইমামের খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল । কল্যাণ, তাকওয়া, জ্ঞান ও নেতৃত্বের আকাশে তিনি পূর্ণ শশীসম কিরণ দিচ্ছিলেন । দলে দলে লোকজন গোপনে তার নিকট আসত এবং অনাদি কল্যাণের ঐ ঝর্ণাধারা থেকে স্বীয় আত্মিক পিপাসা মিটাত ।

মাহদীর গু চররা এ সকল ঘটনার সংবাদ তার কাছে পৌঁছালে স্বীয় খেলাফতের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হলো এবং ইমামকে মদীনা থেকে বাগদাদে এনে বন্দী করার নির্দেশ দিল ।

'আবু খালিদ যাবালেয়ী' বলেন : এ আদেশ অনুসারে যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা হযরতের জন্য মদীনায় গিয়েছিল, ফিরে আসার সময় যাবালেতে হযরতকে সহ আমার গৃহে অবস্থান নিয়েছিল ।

ইমাম ক্ষুদ্র সময়ের সুযোগে, নিযুক্তদের চোখের আড়ালে আমাকে তাঁর জন্য কিছু জিনিস ক্রয় করার নির্দেশ দিলেন । আমি খুব হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিলাম এবং সবিনয়ে নিবেদন করলাম : আপনি যে, রক্তলোলুপের কাছে যাচ্ছেন, তাতে আপনার জন্যে খুব ভয় হয় ।

তিনি বলেলেন : আমি তাকে ভয় করি না । তুমি ঐ দিন ঐ স্থানে আমার জন্য অপেক্ষা কর ।

তিনি (ইমাম) বাগদাদ গেলেন । আমি আশঙ্কার সাথে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলাম । প্রতিশ্রুত দিবস আসল, আমি কথিত স্থানের দিকে ধাবিত হলাম; হৃদয় আমার দুরুদুরু কাঁপছিল, সামান্য শব্দেই লাফিয়ে উঠতাম; অপেক্ষার আগুনে জ্বলছিলাম । একটু একটু করে দিগন্ত রক্তিম হতে লাগল, সূর্য নিশীথের কোলে ঢলে পড়তে লাগল । হঠাৎ দূর থেকে ছায়ার মত কাউকে

দেখলাম ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছিল । হৃদয় আমার চাইল তাদের নিকট উড়ে যাব; আবার ভয় পাচ্ছিলাম যে, যদি তিনি না হয়ে থাকেন; পাছে আমাদের গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়ে যায় ।

যথাস্থানেই অপেক্ষমান থাকলাম, ইমাম আমার নিকটবর্তী হলেন । তিনি একটি খচ্চরের পৃষ্ঠে ছিলেন । যখনই তাঁর দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হলো; বললেন : আবা খালিদ, দ্বিধা করো না ... এবং বলতে লাগলেন : পরবর্তীতে আমাকে আবার বাগদাদে নিবে, আর তখন আর ফিরে আসব না । পরিতাপের বিষয় তেমনটিই ঘটে ছিল ... ।[৪]

যাহোক এ সফরেই যখন আব্বাসীয় খলিফা মাহদী ইমামকে বাগদাদ নিয়ে আসল ও কারারুদ্ধ করল, তখন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)- কে স্বপ্নে দেখল যে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াতটি পাঠ করছেন :

(فهل عسيتم ان تو لّيتم ان تفسدوا في الارض و تقطّعوا ارحامكم)

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তোমরা সম্ভবত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে ।[৫] রাবী বলেন : মধ্যরাত্রিতে আব্বাসীয় খলিফা মাহদী আমাকে ডেকে পাঠাল । খুব সন্ত্রস্ত হলাম ও তার নিকট দ্রুত উপস্থিত হলাম; দেখলাম)..فهل عسيتم. (আয়াতটি পাঠ করছিল ।

অতঃপর বলল : যাও, মুসা ইবনে জা'ফরকে কারাগার থেকে আমার নিকট নিয়ে আস । আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসলাম; মাহদী ওঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে চুম্বন করে নিজের নিকট বসাল, অতঃপর নিজের স্বপ্নের কথা তাঁর নিকট ব্যক্ত করল ।

অতঃপর তৎক্ষণাৎ ইমামকে মদীনায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল ।

রাবী বলেন : পাছে কোন বাধা আসে, এ ভয়ে ঐ রাতেই ইমামের যাত্রা কালীন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তার যাত্রার ব্যবস্থা করলাম প্রভাত আলোয় তিনি মদীনার পথে ছিলেন... ।[৬]

ইমাম মদীনায় আব্বাসীয়দের শ্বাসরূদ্ধকর প্রহরা সত্ত্বেও মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন, জ্ঞান বিতরণ ও শিয়াদেরকে (আধ্যাত্মিক ভাবে) গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত ছিলেন... । ইতোমধ্যে ১৬৯ হিজরীতে মাহদী নিহত হলে তার পুত্র হাদী আব্বাসী রাজতন্ত্রের মসনদে অধিষ্ঠিত হলো ।

হাদী তার পিতার অনুরূপ জনসাধারণের ন্যূনতম অধিকারটুকুও রক্ষা করত না এবং প্রকাশ্যে হযরত আলী (আ.)- এর বংশধরদের সাথে কঠোর আচরণ করত; এমন কি যা কিছু তার পিতা তাদেরকে (হযরত আলীর বংশধরদের) দিয়েছিল তা- ও ছিনিয়ে নিয়েছিল ।

তার ঘৃণ্যতম কৃষ্ণকর্ম হলো ফাখের নৃশংস ও নির্মম হত্যাকান্ড ।

ফাখের মর্মন্তুদ ঘটনা

মদীনার আলাভীগণের মধ্যে হুসাইন ইবনে আলী আব্বাসীয়দের দুঃশাসন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন । তিনি ইমাম মুসা কাযেম (আ.)- এর অনুমতিক্রমে[৭] হাদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন এবং প্রায় ছয়শত সঙ্গী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন ।

হাদীর সৈন্যরা তাকে ফাখ নামক স্থানে অবরোধ করতঃ তার সৈন্যদেরকে শহীদ করল এবং কারবালার বেদনাবিধূর ঘটনার অনুরূপ ঘটনা তাদের ক্ষেত্রেও ঘটল । সকল শহীদের মাথা কর্তন করে মদীনায় নিয়ে আসল এবং হযরত আলীর বংশধরগণ, বিশেষ করে ইমাম মুসা কাযেম (আ.) যে সভায় ছিলেন সেখানে প্রদর্শনীর জন্য রাখল । ইমাম ব্যতীত কেউ কিছু বলল না; ইমাম কাযেম (আ.) ফাখ আন্দোলনের নেতার কর্তিত মস্তক দেখে বললেন :

انّا لله وانّا اليه را جعون مضي و الله مسلما صالحا صوّاما قوّاما آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ما كان في اهل بيته مثله

আমরা আল্লাহ থেকে এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করব । আল্লাহর শপথ সে মুসলমান ও সৎকর্ম করে শাহাদাত বরণ করেছে; সে বেশী বেশী রোযা রাখত ও রাত্রি জাগরণ করত এবং সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধ করত, তার পরিবারের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলনা ।[৮]

হাদী দুষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছাড়াও, ব্যক্তিগত আচরণেও ছিল উচ্চাভিলাষী, মদ্যপ ও আরাম প্রিয় । একদা ইউসুফ সাইকালীকে কয়েক পঙ্ক্তি কবিতা সুন্দর ভঙ্গিতে আবৃতি করার জন্য এক উষ্ট্রের বোঝা পরিমাণ দেরহাম ও দিনার তাকে প্রদান করেছিল ।[৯]

ইবনে দাবনামী বলেন : একদিন হাদীর নিকট গেলাম । তাঁর চোখগুলো মদ পান ও জাগরণের ফলে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল । সে আমার কাছে শরাব সম্বন্ধে কবিতা শুনতে চাইল । আমি একটি কবিতা আবৃতি করলাম । সে কবিতাটি লিখে রাখল এবং আমাকে চল্লিশ হাজার দেরহাম প্রদান করল ।[১০]

আরবের বিখ্যাত গায়ক ইসহাক মুসেলী বলেন : যদি হাদী বেঁচে থাকত আমরা আমাদের গৃহের প্রাচীর স্বর্ণ দিয়ে গড়তাম ।[১১]

যাহোক, অবশেষে হাদীও ১৭০ হিজরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল । আর সেই সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের বাদশাহ হলো হারুন ।[১২]

আর এ সময় ইমাম মুসা কাযেমের বয়স ৪২ বছরে পৌঁছেছিল ।

হারুনের সময় আব্বাসীয় দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য, শক্তি, স্বৈরাচার ও সফলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল ।

হারুন বাইয়াতের অনুষ্ঠান শেষে ইয়াহিয়া বারমাকিকে (ইরানীদের মধ্যে যে বাদশাহের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল) নিজের মন্ত্রী নিযুক্ত করল এবং নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছিল । আর তদানিন্তন সময়ের নিয়মানুসারে এ স্বাধীনতার প্রমাণ হিসেবে স্বীয় আংটি তার অধিকারে রেখেছিল ।[১৩]

অতঃপর হারুন অন্যায়ভাবে বায়তুল মালের টাকা আত্মসাৎ করে মদ, নারী, মণিমুক্তা ক্রয় ও আমোদ- প্রমোদের জন্য ব্যয় করতে লাগল ।

বাইতুল মালের সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ তখন পাঁচশত মিলিয়ন ও দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল, যখন দুই কিংবা চার বছর বয়স্ক একটি মেষ এক দেরহামে ক্রয়- বিক্রয় হত ।[১৪] আর হারুন সে সম্পত্তি নস্যাৎ করার জন্য উদার হস্ত হলো । যেমন : আশযা নামক এক কবিকে তার প্রশংসা গীতির বিনিময়ে এক মিলিয়ন দেরহাম পুরস্কার প্রদান করেছিল ।[১৫] আবুল আতাহিয়া নামক এক কবি এবং ইবরাহীম মুসেলী নামক একজন সংগীতজ্ঞ কয়েক পংক্তি কবিতা ও সংগীত পরিবেশনের জন্য প্রত্যেকেই এক লক্ষ দেরহাম ও একশতটি পোশাক লাভ করেছিল ।[১৬]

হারুনের প্রাসাদে অনেক সুকন্ঠী, সুশীলা ও রূপসী নারীর সমাহার ঘটেছিল এবং তদানিন্তন সময়ের বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র সেখানে বিদ্যমান ছিল ।[১৭] রত্নসম্ভার গড়া ছিলো হারুনের অন্যতম শখের বিষয় । একদা একটি আংটি ক্রয় করার জন্য সে এক লক্ষ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিশোধ করেছিল ।[১৮]

তার রন্ধন শালার প্রতিদিনের খরচ ছিল দশ হাজার দেরহাম । কখনো কখনো তার জন্য ত্রিশ রকমের খাবার তৈরী করা হতো ।[১৯]

হারুন একবার উটের মাংসের খাবার চেয়েছিল । যখন তার জন্য সে খাবার আনা হলো, জা'ফর বারমাকী বলেছিল : খলিফা কি জানেন তার জন্য এই যে খাবার আনা হলো তার মূল্য কত?

জবাবে বলা হল : তিন দেরহাম ... ।

বলল : না, আল্লাহর শপথ, এ পর্যন্ত চার হাজার দেরহাম খরচ হয়েছে । কারণ, অনেকদিন ধরে প্রত্যহ একটি করে উট জবাই করা হচ্ছিল, যাতে খলিফা যদি উটের মাংস চায় তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থিত করা যায় ।![২০]

হারুন একজন জুয়াড়ি এবং মদ্যপও ছিল বটে । কখনো কখনো সে সভায় সকলের উপস্থিতিতেই মদ পান করত । অপরদিকে সে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ইসলামী সভায়ও যেত । যেমন : হজ্ব পালন করত । আবার কখনোবা তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য কোন কোন বক্তাকে অনুরোধ করত ও কাঁদত ... !

ইমামের ভূমিকা

হারুন আব্বাসীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে হযরত আলীর বংশের দৃঢ় অবস্থানের কারণে খুব ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট ছিল; ফলে যে কোন ভাবেই হোক তাদেরকে শাস্তি ও ক্লেশ দেয়ার চেষ্টা করত, চেষ্টা করত সমাজে তাদের মর্যাদাহানির । আর সে হযরত আলী (আ.)- এর পরিবার বর্গের দুর্নাম করার জন্য আত্মবিক্রিত কবি ও দরবারী কীর্তনকারীদেরকে অগণিত অর্থ প্রদান করত উদাহরণস্বরূপ মানসূর নামারীর কথা উল্লেখ করা যায় । সে ইমাম আলীর পরিবারবর্গকে নিন্দা করে কবিতা রচনা করেছে বলে হারুন তাকে বাইতুল মালের কোষাগারে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিল যাতে তার ইচ্ছা মত অর্থ নিতে পারে ।[২১]

বাগদাদের সকল আলাভীগণকে (আলী বংশীয়) মদীনায় নির্বাসন দেয়া হয়েছিল এবং তাদের অগণিত ব্যক্তিকে হত্যা ও বিষ প্রয়োগ করেছিল ।[২২]

এমন কি হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কবর যিয়ারতের জন্য মানুষের আসা যাওয়াটাও সে সহ্য করতে পারত না । সে ইমাম হোসাইনের সমাধিস্থল এবং এর সংলগ্ন গৃহসমূহ বিনষ্ট করার ও ঐ পবিত্র সমাধিস্থলের পার্শ্বে যে কুল গাছ ছিল তা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল ।[২৩] পূর্বে মহানবী (সা.) একে একে তিনবার বলেছিলেন : তার উপর মহান আল্লাহর অভিসম্পাত, যে কুল গাছ কাঁটবে ।[২৪]

নিঃসন্দেহে, ইমাম মুসা কাযেম (আ.) হারুন ও তার পূর্বসূরীদের এ ধরনের অত্যাচারী ও অনৈসলামিক আচার সর্বস্ব হুকুমতের সমর্থন করতে পারেন না । আর এ কারণেই তিনি যদি ফাখের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং নিজের অনুসারীদের সাথে সার্বক্ষণিক গোপন সম্পর্ক রেখে ছিলেন, তবে তা সমসাময়িক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করার জন্যেই ।

ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) একবার, সাফওয়ান ইবনে মেহরানকে বলেছিলেন : তুমি সবদিক থেকেই উত্তম শুধুমাত্র এ দিকটি ব্যতীত যে, তুমি তোমার উটগুলো হারুনকে ভাড়া দিয়ে থাক । সাফওয়ান বলল : হজ্বের জন্য ভাড়া দিয়ে থাকি এবং আমি স্বয়ং উটের সাথে যাই না ।

তিনি বললেন : আর এজন্যেই তুমি অন্তরে কামনা করনা যে, হারুন কমপক্ষে মক্কা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত জীবিত থাকুক, যাতে তোমার উটগুলো না হারায় এবং ভাড়ার মূল্য তোমাকে পরিশোধ করতে পারে?

জবাবে বলল : জী, হ্যাঁ ।

ইমাম বললেন : যদি কেউ অত্যাচারীদের বেঁচে থাকা কামনা করে তবে সে অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হয় ।[২৫]

যদি কাউকে হারুনের শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকার অনুমতি দিয়েও থাকেন তবে তা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এটাকে কল্যাণকর মনে করেছেন বলে । আবার এ কারণেও কাউকে নিযুক্ত করেছেন যে, তিনি জানতেন হারুনের দুঃশাসনে, ভয়, সন্ত্রাস ও শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজমান, আর হুকুমতে তাদের উপস্থিতি শিয়া জনসমষ্টির জন্য লাভজনক এবং তাদের মাধ্যমে আলাভীদের বিরুদ্ধে হুকুমতের প্রবঞ্চনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন । যেমন : আলী ইবনে ইয়াকতীন যখন হারুনের দরবারে স্বীয় পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন, তখন ইমাম কাযেম (আ.) তাকে অনুমতি দেননি ।

যাহোক, কোন অবস্থাতেই ইমাম এ স্বৈরাচারীদেরকে সমর্থন করেননি এমনকি যখন ঐ অত্যাচারীদের হাতের থাবায় বন্দী ছিলেন তখনও ।

একবার ইমামের বন্দীদশায়, হারুন ইয়াহিয়া ইবনে খালিদকে এজন্য কারাগারে প্রেরণ করল যে, মুসা ইবনে জাফর (আ.) যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তাঁকে মুক্তি দিবে । ইমাম এ কর্ম থেকে বিরত থাকলেন ।[২৬]

ইমাম (আ.) এমনকি তাঁর বন্দী অবস্থার নিকৃষ্টতম সময়েও, তাঁর ধীশক্তি, বীরত্ব, সংগ্রামী ও আপোষহীন মনোভাব পরিত্যাগ করেন নি ।

একদা কারাগার থেকে হারুনের নিকট লিখিত নিম্নলিখিত পত্রাংশটুকুর দিকে গভীর মনোযোগ দিলে অনুধাবন করা যায় যে, তা কতটা জ্বালাময়ী, দৃঢ়মনোবলের পরিচয়বহ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি কতটা নিশ্চিত অভিব্যক্তির প্রকাশ বহন করে । যথা :

". . . এমন কোন দিন নেই যে দিন আমি কষ্টে কাটাইনি অথচ এমন কোন দিন নেই যে, তুমি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাওনি ।

কিন্তু, ঐ দিন পর্যন্ত আরাম আয়াশে লি থাক যে দিন আমরা উভয়েই এমন এক জগতে পর্দাপন করব যার কোন শেষ নেই এবং ঐ দিন অত্যাচারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে... ।"[২৭]

যাহোক, হারুন এরূপেই ইমামের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারেনি । এটা আমাদের বোকামী হবে যদি মনে করি যে, হারুন কেবলমাত্র মানুষের অন্তরে ইমামের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও প্রথিত যশার কারণে হিংসাপরায়ণ হয়ে ইমামকে কারাগারে বন্দী করেছিল ।

হারুন ইমামের অনুসারীদের সাথে তাঁর সার্বক্ষণিক যোগাযোগের কথা তার বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছিল এবং সে আরো জানতে পেরেছিল যে, ইমাম যখনই উপযুক্ত সুযোগ পাবেন স্বয়ং বিপ্লব করবেন কিংবা তাঁর সঙ্গীদেরকে আন্দোলন করতে নির্দেশ দিবেন, ফলে তার হুকুমতের অনিবার্য পতন ঘটবে ।

সে দেখল, এ নির্ভীক আত্মার মাঝে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আপোসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, যদিও সাময়িক সময়ের জন্য বাহ্যিকভাবে নিশ্চুপ থাকেন, তবে তার অর্থ নীরবতা নয়, বরং তা হল সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় তাঁর কৌশলগত নীরবতা । এ জন্য সে আগেভাগেই ব্যবস্থা নিল ।

হারুন সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ভাবে ও জনগণকে প্রবঞ্চণা করার জন্য মহানবী (সা.)- এর কবরের পাশে দাঁড়াল এবং খেলাফত হরণ, অত্যাচার ও জনগণের সম্পদ লুট- তরাজকরণ, আর খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরের জন্য কোন প্রকার লজ্জা করার পরিবর্তে মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলল :

“হে রাসূলুল্লাহ! আপনার সন্তান মুসা ইবনে জা’ফরের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি , আমি আন্তরিক ভাবে তাঁকে বন্দী করতে চাই না; কিন্তু আমি এ ভয়ে ভীত যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যুদ্ধ ও বিরোধ সৃষ্টি হবে; আর এজন্যে এ কর্ম করেছি!!”

সে তৎক্ষণাৎ ইমামকে বন্দী ও বসরায় নিয়ে কারারুদ্ধ করার আদেশ দিল । তখন ইমাম সেখানে নবী (সা.)- এর কবরের পাশে নামাযে মশগুল ছিলেন ।

ইমাম বসরার শাসক ঈসা ইবনে জা’ফরের কারাগারে এক বছর বন্দী ছিলেন । ইমামের উত্তম চরিত্র ঈসা ইবনে জা’ফরের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে ঐ জল্লাদ হারুনের নিকট লিখেছিল : তাঁকে আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও নতুবা আমি তাঁকে মুক্ত করে দিব ।

হারুনের আদেশানুসারে, ঐ মহান ব্যক্তিকে বাগদাদে ফাযল ইবনে রাবির নিকট কারারুদ্ধ করা হলো । অতঃপর কিছুদিন ফাযল ইবনে ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হয় । সেখানে, কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকার পর সানদি ইবনে শাহাকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল । একের পর এক এ স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের কারণ ছিল এটাই যে, হারুন প্রতিবারই কারা প্রহরীর নিকট চেয়েছিল যে কোন ভাবে মহান ইমামকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে । কিন্তু তাদের কেউই এ কর্মটি সম্পাদনে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি । অতঃপর এ শেষোক্ত জল্লাদ অর্থাৎ সানদি ইবনে শাহাক ইমামকে বিষ প্রয়োগ করেছিল । তাঁর শাহাদাতের পূর্বে, একদল প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে উপস্থিত করেছিল, যাতে তারা সাক্ষী দেয় যে ইমাম মুসা কাযেম (আ.) চক্রান্তের স্বীকার হননি, বরং কারাগারে স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন । আর এ প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সে আব্বাসীয় খেলাফতকে ঐ মহান ইমামের হত্যার দায়িত্ব ভার থেকে মুক্ত করতে করতে চেয়েছিল । আর সেই সাথে চেয়েছিল ইমামের অনুসারীগণের সম্ভাব্য আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে ।[২৮]

কিন্তু ইমামের প্রত্যুৎপন্নমতিতা ও ধীশক্তি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল । কারণ, যখন ঐ সাক্ষীরা ইমামের দিকে তাকিয়েছিল, তিনি বিষের প্রচণ্ডতা ও বিপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও তাদেরকে

বললেন : আমাকে ৯টি বিষযুক্ত খোরমা দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, আগামীকাল আমার শরীর সবুজ হয়ে যাবে এবং তার পরদিন আমি ইহধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করব ।[২৯]

আর এ ভাবেই ঐ মহানুভব সংবাদ প্রদান করেছিলেন । দু'দিন পর (অর্থাৎ ১৮৩ হিজরীর ২৫শে রজব)[৩০] গগণ ধরায় শোকের ছায়া নেমে আসল । আর সেই সাথে শোকাহত হল বিশ্বাসীগণ, বিশেষ করে শিয়াগণ যারা তাদের প্রিয় ইমামকে হারিয়েছিল । এখন সেই মহান শহীদ সম্পর্কে বলব :

তত্ত্বীয় ও জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ও কথোপকথন

আমাদের ইমামগণ ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, ফলে যে কোন প্রশ্নই তাদেরকে করা হতো তার সঠিক, পূর্ণ ও প্রশ্নকারীর বোধগম্যতার আলোকে জবাব দিতেন । যে কেউ এমন কি শত্রুরাও যদি ইমামগণের সাথে জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বীয় আলোচনায় বসত, স্বীয় অক্ষমতাকে স্বীকার করার পাশাপাশি তাঁদের বিস্তৃত চিন্তা শক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্ণ দখলের কথা অকপটে স্বীকার করত ।

হারুনুর রশিদ ইমাম কাযেম (আ.)- কে মদীনা থেকে বাগদাদ নিয়ে আসল এবং তাঁর সাথে বিতর্কে লি হলো । হারুন : অনেকদিন যাবৎ ভাবছি আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করব, যা আমার মনে জেগেছে । আজোবধি কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি । আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি কখনোই মিথ্যা বলেন না । আমার প্রশ্নের সঠিক ও সত্য জবাব প্রদান করুন!

ইমাম : যদি আমাকে বাক স্বাধীনতা দাও, তবে তোমার প্রশ্ন সম্পর্কে আমি যা জানি, তা তোমাকে অবহিত করব ।

হারুন : আপনি স্বাধীন । আপনার যা বলার মুক্তভাবে ব্যক্ত করতে পারেন... ।

যাহোক আমার প্রথম প্রশ্ন হলো : কেন আপনি এবং জনগণ বিশ্বাস করেন যে, আপনারা আবু তালিবের সন্তানরা, আমরা আব্বাসের সন্তানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন । অথচ আমরা এবং আপনারা একই বৃক্ষের অংশ ।

আবু তালিব ও আব্বাস উভয়েই মহানবী (সা.)- এর চাচা ছিলেন এবং আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ।

ইমাম : আমরা তোমাদের চেয়ে মহানবী (সা.)- এর বেশী নিকটবর্তী ।

হারুন : কিরূপে?

ইমাম : যেহেতু আমাদের পিতা আবু তালিব ও মহানবী (সা.)- এর পিতা পরস্পর আপন ভাই (পিতা ও মাতা একই) ছিলেন কিন্তু আব্বাস আপন ভাই ছিলেন না (কেবলমাত্র মাতৃকূল থেকে) ।

হারুন : অন্য প্রশ্ন : কেন আপনারা দাবী করেন যে, আপনারা মহানবী (সা.) থেকে উত্তরাধিকার প্রা হবেন, অথচ আমরা জানি যে, যখন নবী (সা.) পরলোক গমন করেছেন, তখন তার চাচা আব্বাস (আমাদের পিতা) জীবিত ছিলেন । কিন্তু অপর চাচা আবু তালিব (আপনাদের পিতা) জীবিত ছিলেন না । আর এটা সকলের জানা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত চাচা জীবিত আছেন, চাচার সন্তানের নিকট উত্তরাধিকার পৌঁছে না ।

ইমাম : আমি স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারি তো? হারুন : আলোচনার শুরুতেই আমি বলেছি, মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে আপনি স্বাধীন ।

ইমাম : ইমাম আলী (আ.) বলেন : সন্তানের উপস্থিতিতে, পিতা, মাতা ও স্বামী, স্ত্রী ব্যতীত কেউ উত্তরাধিকার প্রা হবে না । আর সন্তান থাকলে চাচার উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারটি কোরআনে কিংবা রেওয়ায়েতে প্রমাণিত হয়নি । অতএব, যারা চাচাকে পিতার নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করে, নিজ থেকেই বলে এবং তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই । (অতএব, নবীকন্যা যাহরা (আ.)- এর উপস্থিতিতে তাঁর চাচা আব্বাসের নিকট উত্তরাধিকার পৌঁছে না) ।

তাছাড়া আলী (আ.)- এর সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

اقضاكم علىّ

আলী তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক । ওমর ইবনে খাত্তাব থেকেও বর্ণিত হয়েছে :

علىّ اقضانا

আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক : এ বাক্যটি হলো সামগ্রিক তাৎপর্যবহ যা হযরত আলীর জন্য প্রমাণিত হয়েছে । কারণ, সকল প্রকারের বিদ্যা যেগুলোর মাধ্যমে স্বীয় সাহাবীগণকে প্রশংসা করেছেন যেমন : কোরআনের জ্ঞান, আহকামের জ্ঞানও সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুই ইসলামী বিচারের তাৎপর্যে নিহিত রয়েছে । যখন বলা হবে আলী (আ.) বিচারকার্যে সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট, তবে তার অর্থ হবে, তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞানেই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।

(অতএব, ইমাম আলীর এ উক্তি যে, সন্তানের বর্তমানে চাচা উত্তরাধিকার প্রা হবে না তা চূড়ান্ত দলিল রূপে পরিগণিত হবে । সুতরাং একে গ্রহণ করা উচিৎ, না কি যে মত বলে : চাচা

আইনগত ভাবে পিতার স্থানে । কারণ, নবী (সা.)- এর বক্তব্য অনুসারে, আলী (আ.) দীনের আহকাম সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত) ।

হারুন : অপর প্রশ্ন ।

কেন আপনারা মানুষকে অনুমতি দেন আপনাদেরকে রাসূল (সা.)- এর সাথে সম্পর্কিত করতে এবং এ কথা বলতে আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর সন্তান । অথচ আপনারা হলেন আলীর সন্তান । কারণ, প্রত্যেককেই তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হয় (মাতার সাথে নয়) । আর মহানবী (সা.) হলেন আপনাদের নানা ।

ইমাম : যদি মহানবী (সা.) জীবিত হয়ে তোমার কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তবে তুমি কি তোমার কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিবে?

হারুন : সুবহানাল্লাহ, কেন দেব না । বরং ঐ অবস্থায় আরব, অনারব এবং কোরাইশদের সকলের উপর গর্ববোধ করব । ইমাম : কিন্তু নবী (সা.) জীবিত হলে আমার কন্যার জন্য প্রস্তাব দিবেন না, কিংবা আমিও দিব না ।

হারুন : কেন?

ইমাম : কারণ, তিনি আমার পিতা (যদিও মাতৃদিক থেকে) কিন্তু তোমার পিতা নন । (অতএব, নিজেকে আল্লাহর রাসূলের সন্তান বলে মনে করতে পারি) ।

হারুন : তাহলে কেন আপনারা নিজেদেরকে রাসূলের বংশধর বলে মনে করেন । অথচ বংশ পিতৃকুল থেকে নির্ধারিত হয়, মাতৃকুল থেকে নয় ।

ইমাম : আমাকে এ প্রশ্নের জবাব প্রদান থেকে অব্যাহতি দাও ।

হারুন : না, আপনাকে জবাব দিতে হবে; আর সেই সাথে কোরআন থেকে দলিল বর্ণনা করুন.. ।

ইমাম :

)ومن ذرّيّته داود وسليمان و وايّوب ويوسف و مو سي وهارون وكذلك نجزي المحسنين و زكريّا و يحيي و عيسي(

তাহার(ইবরাহীম) বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও, আর এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা .. ।

এখন তোমাকে প্রশ্ন করব : এ আয়াতে যে, ঈসা (আ.) ইবারহীম (আ.)- এর বংশ বলে পরিগণিত হয়েছে, তা কি পিতৃকুল থেকে, না মাতৃকুল থেকে?

হারুন : কোরআনের দলিল মোতাবেক ঈসা (আ.)- এর কোন পিতা ছিলেন না ।

ইমাম : তাহলে মাতৃকুল থেকেই বংশধর বলে পরিগণিত হয়েছে । আমরাও আমাদের মাতা ফাতেমার (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন) দিক থেকে রাসূলের বংশধর বলে পরিগণিত হই ।

অন্য একটি আয়াত পড়ব কি?

হারুন : পড়ুন!

ইমাম : মোবাহেলার আয়াতটি পড়ব :

(فمن حاجّك فيه من بعد ماجائك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنئكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا وانفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين)

“তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্কে লি হয়, তাকে বল; আস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে ও তোমাদের নারিগণকে, আমাদের নিজ দিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা’নত ।”

কেউই এরূপ দাবী করেনি যে, মহানবী (সা.) নাজরানের নাসারাদের সাথে মোবাহেলা করার জন্য আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের সঙ্গী করেছেন । অতএব, উল্লিখিত আয়াতে আব না’য়ানার (আমাদের পুত্রগণ) দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.), যদি ও তারা মাতৃ দিক থেকে রাসূলের সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁর কন্যার সন্তান ।

হারুন : আমার নিকট কিছু চাইবেন কি?

ইমাম : না, আমার নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চাই ।

হারুন : এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখব ... ।[৩১]

ইমামের ইবাদত

ইমাম মুসা কাযেমের বিশেষ খোদা পরিচিতি, মহান প্রভুর প্রতি, তাঁর সত্তাগত জ্যোতির প্রতি তাঁর আত্মিক আকর্ষণ যা পবিত্র ইমামগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সকল কিছুই তাঁকে প্রেমময় ইবাদত ও উপাসনার দিকে ধাবিত করেছিল । তিনি ইবাদতকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন, যেরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন : সামাজিক কর্মকাণ্ডের অবসরে তিনি কিছুকেই এর সমকক্ষ বলে মনে করতেন না । যখন হারুনের নির্দেশক্রমে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন :

الّهمّ انّي طالما كنت اسئلك ان تفرغني لعبادتك وقداستجبت منّي فلك الحمد علي ذالك

প্রভু হে! কতদিন তোমার নিকট চেয়েছি আমাকে (কেবল মাত্র) তোমার ইবাদতের জন্য অবসর দাও । এমন আমার প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করেছ, সুতরাং এজন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ।[৩২]

এ উক্তিটি কারাগারে আসার পূর্ব পর্যন্ত সামাজাকি কর্মকাণ্ডে ইমামের অপরিসীম ব্যস্ততার প্রমাণবহ ।

যখন, ইমাম রাবির কারাগারে ছিলেন, হারুন কখনো কখনো ইমামের কারাগারের ছাদে আসত এবং কারাভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখত । যতবারই তাকাত, প্রত্যেকবারই দেখত একগুচ্ছ জামা কাপড়ের মত কারাগারের এককোণে পড়ে আছে এবং সেখান থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে না । একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ঐ পোশাকগুলো কার?

রাবি বলল : পোশাক নয়, তিনি মুসা ইবনে জা'ফর (আ.) যিনি অধিকাংশ সময়ই প্রভুর ইবাদতের মধ্যে কাটান ও সিজদাবনত হয়ে মাটিতে চুম্বন করেন ।

হারুন বলল : প্রকৃতই তিনি বনি হাশেমের ইবাদতকারীদের অন্তর্ভূক্ত ।

রাবি জিজ্ঞাসা করল : তবে কেন কারাগারে তার উপর কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন ।

হারুন বলল : হায়! এছাড়াতো আমার কোন উপায় নেই!! [৩৩]

একবার হারুন ভরা শশী এক দাসীকে তাঁর সম্মানে পাঠিয়েছিল । আর এর আড়ালে এ কুমন্ত্রণা ছিল যে, যদি ইমাম ঐ দাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে তা হবে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উত্তম হাতিয়ার । ইমাম ঐ নারীর আনয়নকারীকে বললেন : তোমরা এ উপহারের প্রতি প্রলুব্ধ এবং এ গুলোই তোমাদের দম্ভ, এ উপঢৌকন ও এগুলোর মত কিছুই আমার প্রয়োজন নেই । হারুন (আল্লাহর অভিশম্পাত তার উপর) ক্রুদ্ধ হলো এবং ইমামকে এ কথা বলার নির্দেশ দিল যে, আমরা আপনার খুশীমত আপনাকে কারাবন্দী করিনি । (অর্থাৎ এ দাসীর কারাগারে থাকাটাও আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ।)

কালাতিপাত হয়নি, ইমাম ও ঐ দাসীর সম্পর্কের ব্যাপারে সংবাদদাতা গু চররা হারুনকে সংবাদ দিল যে, ঐ তরুণী অধিকাংশ সময়ই সেজাদাবনত থাকে । হারুন বলল : আল্লাহর শপথ! মুসা ইবনে জা'ফর (আ.) ঐ নারীকে যাদু করেছে ... ।

দাসীকে নিয়ে আসার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, সে ইমামের সুনাম ব্যতীত কিছুই বলে নি । হারুন ঐ দাসীকে নিজেদের নিকট আটক রাখার জন্যে তার প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিল যাতে সে কারো নিকট এ ব্যাপারে কিছু না বলতে পারে । ঐ দাসী অনবরত ইবাদতে মশগুল থাকত এবং ইমামের শাহাদাতের কিছু দিন পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল ।[৩৪]

ইমাম এ দোয়াটি প্রায়ই পড়তেন :

اللّهمّ انّي اسالك الرّاحة عند الموت والعفو عند الحساب

প্রভু হে! আমি তোমার কাছে সহজ মৃত্যু কামনা করি, আর কামনা করি বিচার দিবসে সহজ হিসাব ।[৩৫]

ইমাম মুসা কাযেম (আ.) এত সুন্দর ও সুললিত কন্ঠে কোরআন পড়তেন যে, যে কেউ তাঁর কোরআন পাঠ শুনত, ক্রন্দন করত । মদীনার অধিবাসীরা তাঁকে 'যাইনুল মুতাহাজ্জেদীন' অর্থাৎ রাত্রি জাগরণকারীদের সৌন্দর্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন ।[৩৬]

ইমামের মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা ও নম্রতা

ইমামের মহানুভবতা ও সহনশীলতা ছিল অতুলনীয় যা অপরের জন্য ছিল আদর্শ ।

তাঁর 'কাযেম' (كاظم) উপাধিটি যা তাঁর নামের সাথে সংযোজিত হয়, তা তাঁর এ বৈশিষ্ট্য থেকেই উৎসারিত এবং ক্রোধ অবদমনকারী ও সহিষ্ণু হিসেবে তাঁর খ্যাতির প্রমাণবহ ।

যে দুঃসময়গুলোতে, আব্বাসীয়রা ইসলামী সমাজের সর্বত্র শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষের ধন- সম্পদ বায়তুল মালের নামে হরণ করে নিজেদের আরাম- আয়েশের পথে ব্যয় করত । আর তাদের অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল । অধিকাংশ মানুষ অসামাজিক, সংস্কৃতিবিবর্জিত ও দরিদ্র হয়ে পড়েছিল । অপরদিকে আলাভীদের (আলী বংশীয়) বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের অপপ্রচার নির্বোধ মানুষের মন তাঁর সম্পর্কে বিষিয়ে তুলেছিল । কখনো কখনো অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ ইমামের সাথে দুর্ব্যবহার করত । কিন্তু ইমাম স্বীয় মহানুভবতা ও সমুন্নত আচরণের মাধ্যমে তাদের ক্রোধ সংবরণ করাতেন এবং সুন্দর ভাষায় তাদেরকে উপদেশ দিতেন ।

মদীনায় বসবাসরত দ্বিতীয় খলিফার বংশধরদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইমামকে কষ্ট দিত এবং কখনো ইমামকে দেখলে কটু কথা বলত ও অবমাননা করত ।

ইমামের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পরামর্শ দিয়েছিল । ইমাম তাদেরকে কঠোর ভাবে এ কর্ম থেকে বিরত রাখলেন ।

একদা ইমাম মদীনার বাইরে এক শস্যক্ষেতে ওকে দেখলেন । পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন ও তার নিকটবর্তী হলেন এবং পশুর পৃষ্ঠে আরোহী অবস্থায়ই শস্য ক্ষেতে প্রবেশ করলে সে চিৎকার করে বলল : আমার শস্য পদদলিত করবেন না! হযরত তার কথায় কান না দিয়ে তার কাছে গেলেন এবং যখন তার কাছে পৌঁছলেন[৩৭] পশুপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন । উদার দয়াদ্র ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

এ ফসলের জন্য কত খরচ করেছে?

বলল : একশত দিনার

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কতটা লাভ পাওয়ার আশা কর?

বলল : অদৃশ্যের ব্যাপার, আমি জানি না ।

ইমাম বললেন : আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কতটা তুমি আশাবাদী?

বলল : দুইশত দিনার লাভ পাওয়ার আশা করি । হযরত তাকে তিনশত দিনার প্রদান করলেন এবং বললেন এ ফসলও তোমার নিজেরই থাকল । মহান আল্লাহ তোমাকে যা কামনা করছ তা দান করবেন ।

লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং হযরতের মাথায় চুম্বন করল এবং তাঁর কাছে পূর্ববর্তী অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল । ইমাম স্মিত হাসলেন এবং ফিরে আসলেন ।

পরদিন ঐ ব্যক্তি মসজিদে বসেছিল । ইমাম সেখানে প্রবেশ করলেন । ঐ ব্যক্তি ইমামকে দেখেই বলতে লাগল :

الله اعلم حيث يجعل رسالته

মহান আল্লাহ যথার্থই অবগত আছেন যে, স্বীয় রেসালাত কাকে দিবেন (অর্থাৎ ইমাম মুসা ইবনে জা'ফর (আ.) প্রকৃতই ইমামতের যোগ্য) ।

তার বন্ধুরা আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল : ঘটনা কী, পূর্বে তো তুমি তার কুৎসা রটাতে?

সে পুনরায় ইমামকে দোয়া করল এবং তার বন্ধুরা তার সাথে বিবাদে লি হলো .. । ইমামের যে সকল সঙ্গীরা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন : কোনটি উত্তম তোমাদের নিয়ত, না আমি যে স্বীয় ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে পথে আনলাম তা?[৩৮]

ইমামের বদান্যতা ও দানশীলতা

ইমাম মুসা কাযেম (আ.) পৃথিবীকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে দেখতেন না । যদি কোন অর্থ সম্পদ তাঁর হস্তগত হতো, তবে তার মাধ্যমে চাইতেন কল্যাণকর্ম সম্পাদন করতে, বিপর্যস্ত, পরিশ্রান্তদের আত্মাকে প্রশান্ত করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে আর বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে ।

মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ বাকরী বলেন : অর্থনৈতিকভাবে খুব সংকটের মধ্যে ছিলাম এবং অর্থ ঋণ করার জন্য মদীনায় গেলাম । কিন্তু এ দিক ও দিক ঘোরা ফিরা করেও সফল হতে পারলাম না এবং খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । আপন মনে ভাবলাম, আবুল হাসান মুসা ইবনে জাফরের (তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক) নিকট যাব এবং স্বীয় হতভাগ্যতা সম্পর্কে তার নিকট অভিযোগ করব ।

খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে মদীনার বাইরে একটি গাঁয়ের শস্য ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় পেলাম । ইমাম আমাকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করার জন্যে আমার নিকট আসলেন এবং আমার সঙ্গে আহার গ্রহণ করলেন । আহার গ্রহণ শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সাথে কি কোন কাজ আছে? তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললাম । তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শস্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী একটি কুঠুরীতে গেলেন । ফিরে এসে আমাকে ছয়শত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলেন । আমি আমার বাহনে আরোহন করে গন্তব্যে ফিরে আসলাম ।[৩৯]

নব্বই বছর বয়স্ক ঈসা ইবনে মুহম্মদ বলেন : একবছর খারবুজা : (বাঙ্গী জাতীয় ফল), শশা ও কদুর চাষ করেছিলাম; তোলার সময়, পঙ্গপাল সব ফসল নষ্ট করে ফেলেছিল এবং আমার একশত বিশ দিনার ক্ষতি হয়েছিল ।

এ সময় হযরত ইমাম কাযেম (আ.) যেন তিনি আমাদের সকলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত) একদিন আমার নিকট আসলেন ও সালাম করলেন এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন; সবিনয়ে নিবেদন করলাম পঙ্গপাল আমার সকল ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে ।

জিজ্ঞাসা করলেন : কতটা ক্ষতি হয়েছে?

বললাম : উটের খরচসহ ১২০ দিনার ।

ইমাম আমাকে একশত পঞ্চাশ দিনার প্রদান করলেন ।

সবিনয়ে বললাম আপনি কল্যাণময় অস্তিত্ব, আমার শস্যক্ষেতে এসে একটু দোয়া করুন ।

ইমাম আসলেন ও দোয়া করলেন এবং বললেন : মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পঙ্গপালের উচ্ছিষ্ট এবং যে সকল সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তার সাথে লেগে থাক (অর্থাৎ তা পরিত্যাগ করো না) ।

আমি ঐ জমিতে সেচ দিয়েছিলাম এবং মহান আল্লাহ তাতে এমন বরকত দিয়েছিলেন যে দশ হাজার (দিনারের ফসল) বিক্রি করেছিলাম ।[৪০]

ইমামের বক্তব্য

১. বিনয় হলো তাতেই মানুষের সাথে সেরূপ আচরণ কর যেরূপ তুমি মানুষের কাছে আশা কর ।[৪১]

২. খোদা পরিচিতির পরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা হলো নামায, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ এবং হিংসা, স্বেচ্ছাচার, অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা পরিহার ।[৪২]

৩. যে প্রতারণা করে, কোন মুসলমানের নিকট কোন বস্তুর ত্রুটি ঢেকে রাখে কিংবা অন্য কোনভাবে তাকে প্রবঞ্চনা করে, ধোঁকা দেয়, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত অনিবার্য ।[৪৩]

৪. কপট ও দ্বিমুখো হলো আল্লাহর বান্দাদের নিকৃষ্টতম কাজ । দীনী ভাইয়ের সম্মুখে তার প্রশংসা করে আর তার অবর্তমানে কুৎসা রটনা করে কিংবা যদি তার মুসলমান ভাই কোন বৈভব লাভ করে, তবে সে পরশ্রীকাতরতায় ভোগে, আবার যখন তার উপর বিপদ আপতিত হয়, তবে তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে ।[৪৪]

৫. যদি কেউ পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তার হৃদয় থেকে আখেরাতের ভয় বিদায় গ্রহণ করে ।[৪৫]

৬. خير الامور اوسطها মধ্যপন্থা হলো সর্বোত্তম কর্ম ।[৪৬]

৭. حصّنوا اموالكم بالزكا স্বীয় সম্পদসমূহকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে রক্ষা কর ।[৪৭]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর দরুদ বর্ষিত হোক, যিনি ছিলেন সত্য ইমাম; পথপ্রদর্শক হিসাবে ও ঐশী শিষ্টাচারে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম । মুক্তগণের ও শহীদগণের ঔষ্ঠাধার থেকে তার উপর বর্ষিত হোক দরুদ ।

ইমামের ইমামত সম্পর্কে আলোচনা

আমাদের প্রিয় ইমামগণের রীতি ছিল জ্ঞানগত, রাজনৈতিক ও দীনী কেন্দ্ররূপে নিজের পরবর্তী ইমামকে পরিচয় করানোর জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করতেন, যাতে একদিকে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য এ পথের অপব্যবহার করার মত কোন সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে; অপরদিকে সত্য অনুসারীরা তাঁকে চিনে নিতে পারে । আর এ জন্যেই আব্বাসীয়দের শ্বাসরুদ্ধকর দুঃশাসনের মধ্যেও তিনি নিজের পর ইমাম কাযেমের ইমামত সম্পর্কে তাঁর মহান পিতা বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন । এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব :

১. আলী ইবনে জা'ফর (আ.) বলেন : আমার পিতা ইমাম সাদেক (আ.) তাঁর একদল সাহাবীকে বলেছিলেন : আমার সন্তান মুসা সম্পর্কে আমার আদেশ গ্রহণ কর, কারণ সে আমার সন্তানদের মধ্যে এবং যারা আমার স্মরণে আছে তাদের সকলের চেয়ে উত্তম । সে আমার উত্তরাধিকারী, আমার পর সকল বান্দাগণের উপর আল্লাহর হুজ্জাত হবে ।[৪৮]

আমর ইবনে আবান বলেন : ইমাম সাদেক (আ.) তাঁর পরবর্তী ইমামগণের (আ.) নাম বর্ণনা করেছিলেন ।

২. আমি তাঁর পুত্র ইসমাইলের নাম উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! এ কর্মে আমাদের কোন স্বাধীনতা নেই, এর দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ।[৪৯]

৩. ইমাম সাদেক (আ.)- এর প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে জোরারাহ নামক একজন শিষ্য বলেন : ঐ মহান ব্যক্তির নিকট ছিলাম; তাঁর অন্যতম সন্তান মুসা (আ.) তাঁর ডান পার্শ্বে ছিলেন এবং একটি শবদেহ (যা তাঁর অন্য সন্তান ইসমাইলের) তাঁর সম্মুখে শায়িত ছিল । ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.) আমাকে বললেন : জোরারাহ । যাও দাউদ রাকী, হোমরান ও আবু বাসিরকে (ইমামের তিনজন সহযোগী) ডেকে নিয়ে আস ।

আমি তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসলাম । অন্যান্যরাও আসল এবং কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে গেল ।

ইমাম দাউদ রাকীকে বললেন : শবদেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে নাও । ইমাম যা বললেন, দাউদ তাই করল । অতঃপর তিনি বললেন : দাউদ! দেখতো ইসমাইল জীবিত, না মৃত!

সে বলল : হে আমার নেতা, মৃত ।

ইমাম একে একে প্রত্যেককে শবদেহ দেখালেন এবং সকলেই বলল যে 'মৃত' । অতঃপর তিনি বললেন : হে প্রভু! তুমি সাক্ষী থাক (যে মানুষকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কতটা চেষ্টা করেছি) । অতঃপর মৃতকে গোসল ও সুগন্ধি মেখে কাফন পড়াতে নির্দেশ দিলেন । যখন সব কাজ সম্পন্ন হল পুনরায় মোফাজ্জালকে আদেশ দিলেন : তার মুখের কাফন খুলে দাও ।

মোফাজ্জাল তা- ই করল, যা ইমাম বললেন । অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন : জীবিত না মৃত? মোফাজ্জল সবিনয়ে জবাব দিল : মৃত । পুনরায় উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং সকলেই পূর্বের মত জবাব দিল । হযরত পুনরায় বললেন : প্রভু হে! তুমি সাক্ষী থাক । কিন্তু তারপর ও একদল যারা আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়, তারা ইসমাইলের ইমামতের বিষয়টি উত্থাপন করবে । এ সময় তার সন্তান হযরত মুসা (আ.)- এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : মহান আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে নির্ধারণ করে থাকেন, যদিও একদল তা না চেয়ে থাকে ।

ইসমাইলকে সমাধিস্থ করা হলো । ইমাম উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন : যাকে এখানে কবরস্থ করা হলো সে কে? সকলেই বলল : আপনার সন্তান ইসমাইল । ইমাম বললেন : প্রভু হে ! তুমি সাক্ষী থাক । অতঃপর স্বীয় সন্তান মুসা (আ.)- কে ধরে বললেন :

هو الحقّ و الحقّ معه ومنه الي ان يرث الله الارض و من عليها

সে সত্যের উপর ও সত্যের সাথে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সত্য তার থেকে ।[৫০]

৪. মানসূর ইবনে হাযিম বলেন যে, ইমাম সাদেক (আ.)- এর নিকট নিবেদন করলাম : আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, সব সময় জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়; যদি আপনার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে তবে কে আমাদের ইমাম হবেন? ইমাম তাঁর সন্তান আবুল হাসান মুসা (আ.)- এর স্কন্ধে হাত রাখলেন এবং বললেন : যদি আমার কিছু ঘটে আমার এ সন্তান তোমাদের ইমাম হবে । ইমাম মুসা কাযেম (আ.) তখন পাঁচ বছরের ছিলেন এবং ইমাম জা'ফর

সাদেকের অপর সন্তান আবদুল্লাহ (পরবর্তীতে কেউ কেউ তার ইমামতে বিশ্বাসী ছিল) সে সভায় আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ।

৫. শেখ মুফিদ (আল্লাহ তাঁর পবিত্র আত্মার উপর অপরিসীম রহমত বর্ষণ করুন) বলেন : ষষ্ঠ ইমামের একদল সঙ্গী যেমন : মোফাজ্জল ইবনে উমর, মা'য়ায ইবনে কাসির, আবদুর রহমান ইবনে হাজ্জাজ, ফাইয ইবনে মোখতার, ইয়াকুব সিরাজ, সোলাইমান ইবনে খালিদ, সাফওয়ান জাম্মাল এবং অন্যান্যরা (যাদের নাম উল্লেখ করা সময়সাপেক্ষ) হযরত ইমাম কাযেম (আ.)- এর উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি বর্ণনা করেছিলেন । অনুরূপ ইমামের দু'ভাই ইসহাক ও আলী (যাদের তাকওয়া, ফযিলাত ও পরহেজগারীর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই) থেকেও বর্ণিত হয়েছে ।[৫১]

এছাড়া ষষ্ঠ ইমামের পক্ষ থেকে এতটা গুরুত্ব ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে বিশেষ করে শিয়া এবং যারা ষষ্ঠ ইমামের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের জন্য এটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপে প্রতীয়মাণ ছিল যে, তাঁর পর তার প্রিয় পুত্র আবুল হাসান মুসা ইবনে জা'ফার আল কাযেম ইমাম হবেন, ইসমাইল (যিনি তাঁর পিতার বর্তমানেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন) নন বা ইসমাইলের পুত্র মুহাম্মদও নন; কিংবা ইমাম সাদেকের অন্য পুত্র আবদুল্লাহ্ও নন । এতকিছুর পরও সত্য ইমাম জা'ফর সাদেকের শাহাদাতের পর একদল তার পুত্র ইসমাইল বা ইসমাইলের পুত্র অথবা অন্য পুত্র আবদুল্লাহর ইমামতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল । আর তাঁদের জন্য যে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা হয়েছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল ।

ইমামের প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ

ইমামের জ্ঞান ও আচরণ, ইসলামের নবীর ও তাঁর পবিত্র পূর্বপুরুষগণের জ্ঞান ও আচরণের প্রকাশ । সকল জ্ঞানপিপাসু তার প্রতিষ্ঠানের ঝর্ণাধারা থেকেই তৃষ্ণা নিবারণ করত এবং তাঁর ছাত্ররা এরূপে জ্ঞানার্জন করত যে স্বল্প সময়ে ইমান ও জ্ঞানের উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন ।

তাঁর জীবনের প্রায় বিশ বছর অতিক্রম হলে, তাঁর প্রিয় পিতা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন । আর তখন থেকে তাঁর পিতার ছাত্রগণ তাঁর দিকে মুখ করেছিল এবং ত্রিশাধিক বছর তাঁর জীবন থেকে কল্যাণ গ্রহণ করেছিল ।[৫২]

তাঁর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রা রা ফিকাহশাস্ত্র, হাদীস, কালাম ও বিতর্কে ছিলেন অনন্য । আর আখলাক, আমল ও মুসলমানদের সেবার ক্ষেত্রে তাঁরা তদানিন্তন যুগের আদর্শ ছিলেন । কালামশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাঁদের কারো সাথেই বিতর্কের ক্ষমতা রাখতনা এবং তাঁদের সাথে কেউ বিতর্কে লি হলে অতিদ্রুত পরাভূত হতো এবং স্বীয় অক্ষমতাকে স্বীকার করত ।

ইমামের এ ছাত্রদের মহান ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব তাঁর বিরোধীদের, বিশেষ করে তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠীর চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল । শত্রুরা এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের সামাজিক অবস্থান ও জনপ্রিয়তা নিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করবে ও মানুষকে তাদের দিকে আকর্ষণ করবে ।

এখন আমরা এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রা কয়েকজনের কথা উল্লেখ করব । যথা :

১. ইবেন আবি উমাইর : তিনি ২১৭ হিজরীতে পরলোক গমণ করেন । তিনি তিনজন ইমামকে [ইমাম কাযেম (আ.), ইমাম রেযা (আ.) ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)] দেখতে পেয়েছিলেন এবং পবিত্র ইমামগণের খ্যাতিমান ছাত্রবর্গের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত । বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার মাধ্যমে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে । তার উচ্চমর্যাদা শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবেই প্রসিদ্ধ এবং এ উভয় মাযহাবেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা বিদ্যমান ছিল । যাহিয

নামক সুন্নী একজন মনীষী তার সম্পর্কে লিখেন : 'ইবনে আবি উমাইর তার সমসাময়িক কালে সকল বিষয়ে অনন্য ছিলেন ।[৫৩]

ফাযল ইবনে শাযান বলেন : কেউ কেউ তৎকালীন প্রশাসনকে সংবাদ দিল যে, ইবনে আবি উমাইর ইরাকের সকল শিয়াদের নাম জানেন; প্রশাসন তার নিকট চেয়েছিল যে, তিনি তাদের নাম বলে দিবেন; কিন্তু তিনি বলতে অস্বীকৃতি জানালেন । ফলে তাকে উলঙ্গ করে দুই খোরমা গাছের মাঝে ঝুলিয়ে একশতটি চাবুক মারা হলো । আর সেই সাথে তার একলক্ষ দেরহাম অর্থনৈতিক ক্ষতি করা হলো ।[৫৪]

ইবনে বুকাইর বলেন : ইবনে আবি উমাইর কারাবন্দী হলেন এবং সেখানে তার উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালানো হয়েছিল । তারপরও তার যা সম্পদ ছিল তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ।[৫৫] আর তার এ ধরনের কারাবন্দী ও সংকটাপন্ন হওয়ার ফলেই তার হাদীস গ্রন্থগুলো বিলু হয়ে গিয়েছিল ।

শেখ মুফিদ বলেন : ইবনে আবি উমাইর সতের বছর ধরে কারাবন্দী ছিলেন, তার সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । এক ব্যক্তি দশ হাজার দেরহাম ইবনে আবি উমাইরের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল । সে যখন বুঝতে পারল যে ইবনে আবি উমাইরের সকল সম্পদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন নিজের গৃহ বিক্রি করে তার (ইবনে আবি উমাইর) দশ হাজার দেরহাম তার নিকট নিয়ে এসেছিল ।

ইবনে আবি উমাইর জিজ্ঞাসা করলেন : এ অর্থ কোথা থেকে এনেছ? তুমি কি কোন উত্তরাধিকার পেয়েছ, না- কি গু ধন পেয়েছ?

সে বলল : আমার গৃহ বিক্রি করেছি!

ইবনে আবি উমাইর বললেন : ইমাম সাদেক (আ.) বলেছেন যে, গৃহ আবাসস্থল যা প্রয়োজনীয় তা ঋণ বহির্ভূত । সুতরাং আমার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এ অর্থ থেকে এক দেরহামও গ্রহণ করব না ।[৫৬]

২. সাফওয়ান ইবনে মেহরান : সাফওয়ান ছিলেন পবিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভূক্ত । প্রখ্যাত আলেমগণ তাঁর রেওয়ায়েতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন । তার আচার- আচরণ এতটা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌঁছেছে যে, ইমাম এর স্বীকৃতি দিয়ে ছিলেন । যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যখনই ইমামের নিকট শুনেছিলেন যে, অত্যাচারীদেরকে সাহায্য করা অনুচিৎ, তখন থেকেই তাদেরকে (হারুনকে) সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকলেন । আর যে উটগুলো হারুনকে ভাড়া দিতেন, সেগুলো বিক্রি করে দিলেন, যাতে এ পথে অত্যাচারীদেরকে সাহায্য করতে বাধ্য না হন ।[৫৭]

৩. সাফওয়ান ইবনে ইয়াহিয়া : তিনি ইমাম কাযেম (আ.)- এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন । শেখ তুসী বলেন : সাফওয়ান হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট তার সময়কালের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ বলে পরিগণিত ।[৫৮]

সাফওয়ান অষ্টম ইমামকেও দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিলেন ।[৫৯] ইমাম জাওয়াদ (আ.) ও সাফওয়ানের প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন : মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি (আমি তার প্রতি যে সন্তুষ্ট আছি) সন্তুষ্ট হবেন, সে কখনোই আমার এবং আমার পিতার অবাধ্য হয়নি ।[৬০]

ইমাম কাযেম (আ.) বলতেন : কোন রাখালবিহীন মেষদলের উপর দু'টি হিং নেকড়ের আক্রমণে যতটা ক্ষতি হয়, তা কোন ব্যক্তির ক্ষমতার প্রতি লোভ তার দীনের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে বেশী নয় এবং বলেন : কিন্তু এ সাফওয়ান ক্ষমতা লোভী নয় ।[৬১]

৪. আলী ইবনে ইয়াকতীন : তিনি ১২৪ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা ছিলেন শিয়া । তিনি নিজের ধন- সম্পদ থেকে ইমাম সাদিক (আ.)- এর জন্য পাঠাতেন ।

মারওয়ান তার পিছু নিয়েছিল । তিনি পলায়ন করেছিলেন । তার দু'পুত্র আলী এবং আবদুল্লাহ্ মদীনায় গিয়েছিল । উমাইয়্যা শাসনের পতন ঘটার পর ইয়াকতীন আত্মপ্রকাশ করলেন এবং স্ত্রী ও দু'পুত্র সহ কুফায় ফিরে আসলেন ।[৬২]

আলী ইবনে ইয়াকতীন আব্বাসীয়দের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন । ফলে হুকুমতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ তার ভাগ্যে জুটেছিল । আর একই সাথে তিনি শিয়াদের আশ্রয়স্থল ও সহযোগী হয়েছিলেন এবং এভাবে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন ।

হারুনুর রশিদ, আলী ইবনে ইয়াকতীনকে তার মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিল । আলী ইবনে ইয়াকতীন ইমাম কাযেম (আ.)- কে নিবেদন করেছিলেন : এদের প্রশাসনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

ইমাম বললেন : যদি বাধ্য হয়ে থাক, তবে শিয়াদের ধনসম্পদ (নষ্ট করা) থেকে বিরত থেক । এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : আলী ইবনে ইয়াকতীন আমাকে বললেন যে শিয়াদের মালামাল বাহ্যিক ভাবে সংগ্রহ করব । কিন্তু গোপনে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিব ।[৬৩]

একবার ইয়াকতীন ইমাম কাযেম (আ.)- কে লিখেছিলেন, বাদশাহর কর্মকাণ্ডে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে; মহান আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন; যদি অনুমতি দেন, তবে আমি এ কর্মে ইস্তফা দিব ।

ইমাম জবাবে তাকে লিখেছিলেন : তোমাকে এ অনুমতি দিবনা যে, কর্ম থেকে ইস্তফা দিবে আর আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যাবে ।[৬৪]

একবার ইমাম তাকে বললেন : একটি কাজের অঙ্গীকার কর, আমি তোমার জন্য তিনটি জিনিস অঙ্গীকার করব, আর তা হলো তরবারি দিয়ে মৃত্যু হবেনা, দারিদ্র্য স্পর্শ করবে না এবং কারারুদ্ধ হবে না ।

আলী ইবনে ইয়াকতীন বললেন : আমাকে যে কর্মের অঙ্গীকার করতে হবে, তা কী?

তিনি বললেন : যখনই তোমার নিকট আমাদের কোন বন্ধু আসবে, তাকে সম্মান করবে ।[৬৫]

আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াহিয়া কাহেলী বলেন : ইমাম কাযেমের নিকট উপস্থিত ছিলাম । আলী ইবনে ইয়াকতীন তখন হযরতের দিকে আসছিলেন । ইমাম তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন : যদি কেউ রাসূল (সা.)- এর কোন সাহাবীকে দেখতে চায়, তবে যে ব্যক্তি এ দিকে আসছে, তাকে

দেখতে পারে । উপস্থিত একজন বললেন : তবে কি তিনি বেহেশতী হবেন? ইমাম বললেন : আমি সাক্ষ্য দিব যে, তিনি বেহেশতবাসীদের মধ্যে একজন ।[৬৬]

আলী ইবনে ইয়াকতীন ইমামের আদেশ পালন করাতে কখনোই অবহেলা করতেন না । তিনি যে কোন আদেশ দিতেন, অবিলম্বে তা পালন করতেন, যদিও তার রহস্য তিনি জানতেন না।

একদা, হারুনুর রশিদ আলী ইবনে ইয়াকতীনকে কিছু পোশাক উপহার হিসেবে দিয়েছিল । এগুলোর মধ্যে একটি রাজকীয় পোশাক ছিল । তিনি রাজকীয় পোশাকসহ ঐ পোশাকগুলো ও কিছু মালামাল ইমাম কাযেমের জন্য পাঠিয়েছিলেন । ইমাম ঐ রাজকীয় পোশাক ব্যতীত আর সবকিছু গ্রহণ করলেন এবং আলী ইবনে ইয়াকতীনকে লিখেছিলেন : এ পোশাকটি সংরক্ষণ কর এবং হাতছাড়া কর না । খুব শী ই তা তোমার প্রয়োজনে আসবে ।

আলী ইবনে ইয়াকতীন অনুধাবন করতে পারেনি যে, কেন হযরত ঐ পোশাক ফেরৎ দিয়েছিলেন । কিন্তু তা সংরক্ষণ করলেন । কিছু দিন যেতে না যেতেই আলী ইবনে ইয়াকতীন তার এক ঘনিষ্ঠ গোলাম কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হলেন ও তাকে বহিস্কার করলেন । ঐ গোলাম ইমাম কাযেমের প্রতি তার দুর্রলতা সম্পর্কে জানত এবং ইমামের জন্য প্রেরিত মালামাল সম্পর্কেও সে অবগত ছিল । সে হারুনের নিকট গেল এবং যা জানত তা হারুনকে বলল । হারুন ক্রুদ্ধ হল এবং বলল আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করব । যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তাকে হত্যা করব । তৎক্ষণাৎ আলী ইবনে ইয়াকতীনকে ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞাসা করল : তোমাকে যে রাজকীয় পোশাক দিয়েছিলাম তা কি করেছ?

তিনি বললেন : তাকে সুগন্ধি মেখে, নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করেছি ।

হারুন বলল : এখনই তা নিয়ে আস!

আলী ইবনে ইয়াকতীন তার একজন খাদেমকে পাঠালেন; পোশাকটি আনা হলো এবং হারুনের সম্মুখে রাখা হলো । হারুন পোশাকটি দেখে তুষ্ট হলো এবং আলী ইবনে ইয়াকতীনকে লক্ষ্য করে বলল : পোশাকটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নাও এবং তুমিও নিরাপদে ফিরে যাও । এ মানহানির পর তোমার ব্যাপারে কোন কথা বিশ্বাস করব না । সে ঐ গোলামকে এক হাজারটি চাবুকাঘাত নির্দেশ

দিল । সে (গোলাম) পাঁচশতটি চাবুকাঘাত খেতে না খেতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ।[৬৭] আলী ইবনে ইয়াকতীন ১৮২ হিজরীতে, যখন ইমাম মুসা ইবনে জা'ফর কারাগারে ছিলেন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন ।[৬৮]

তার কিতাবসমূহের মধ্যে কোন কোনটির নাম শেখ মুফিদ ও শেখ সাদুক উল্লেখ করেছেন ।[৬৯]

৫. মুমিন তা'ক : মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে নো'মান যার কুনিয়াহ হলো আবু জা'ফর এবং খেতাব মুমিন তা'ক, ছিলেন ইমাম সাদেক (আ.) ও ইমাম কাযেম (আ.)- এর সাহাবী । তিনি ইমাম সাদেকের নিকট মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিলেন । ইমাম তাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে গণনা করেছেন ।

মুমিন তা'ক এ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন যে, যার সাথেই তিনি বিতর্কে লি হন না কেন তাকে পরাস্ত করবেনই ।

ইমাম সাদেক (আ.) তাঁর কোন কোন সাহাবীকে অক্ষমতা ও স্বল্প যোগ্যতার জন্য কালামি (আকীদা বিষয়ক) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন । কিন্তু মুমিন তা'ককে এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন ।

ইমাম সাদেক (আ.) তার (মুমিন তা'ক) সম্পর্কে খালিদকে এরূপ বলেছিলেন : তা' কের মালিক (শক্তির অধিপতি) মানুষের সাথে বিতর্কে লি হয় এবং শিকারী বাজের মত শিকারের উপর অবতীর্ণ হয় । যদি তোমার পাখা ছিড়ে ফেলা হয়, তবে তুমি কখনোই উড়বে না ।[৭০]

যখন ইমাম সাদেক (আ.) শাহাদাত বরণ করেন, আবু হানিফা মুমিন তা'ককে তিরস্কার করে বলেছিল তোমার ইমাম তো বিদায় নিয়েছে । মুমিন তা'ক তাকে তৎক্ষনাৎ জবাব দিলেন : কিন্তু তোমার ইমামকে নির্দিষ্ট দিবস পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে । অর্থাৎ তোমার ইমাম হলো শয়তান, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

(فانّك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم)

"যাদেরকে অবকাশ প্রদান করা হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত ।" সূরা হিজর : ৩৭- ৩৮)

৬. হিশাম ইবনে হাকাম : তিনি তর্কশাস্ত্র, বিতর্ক ও কালাম শাস্ত্রে ছিলেন অপ্রতিদ্ব ী এবং অন্য সকলের চেয়ে এ বিদ্যায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল । ইবনে নাদিম লিখেন যে, শিয়া কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে হিশাম এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ইমামতের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন; তিনি কালাম শাস্ত্রে দক্ষ ও উপস্থিত বুদ্ধি- সম্পন্ন ছিলেন ।[৭১]

হিশাম অনেক পুস্তক লিখেছিলেন । তিনি বিভিন্ন মাযহাব ও ধর্মের আলেমদের সাথে চমৎকার বিতর্কে লি হয়েছিলেন ।

ইয়াহিয়া ইবনে যালিদ বারমাকি হারুনের উপস্থিতিতে হিশামকে বলেছিল : সত্য পরস্পর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়াতে পারে কি? হিশাম বললেন : না । ইয়াহিয়া বললেন : তাহলে এমনটি নয় কি, যখন দু'ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় ও বিতর্কে লি হয়, তখন হয় উভয়েই সঠিক অথবা উভয়েই মিথ্যা কিংবা একজন সত্য ও অন্যজন মিথ্যার পথে আছে? হিশাম বললেন : হ্যাঁ, এ তিন অবস্থার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু প্রথম অবস্থা সম্ভব নয় যে, উভয়েই সত্যের উপর থাকবে ।

ইয়াহিয়া বলল : যদি আপনি একথা স্বীকার করেন যে, দীনের কোন হুকুমের ক্ষেত্রে বিবাদরত দু'পক্ষের উভয়েই সত্য পথের উপর হতে পারে না, তবে আলী (আ.) এবং আব্বাস যে, রাসূলের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আবু বকরের নিকট এসে ছিলেন তাদের বিবাদ মীমাংসা করে দেয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে কে সত্যের উপর ছিলেন?

হিশাম বললেন, তাঁদের মধ্যে কেউই ভ্রান্ত পথে গমণ করেনি । তাদের ঘটনার দৃষ্টান্ত আরও আছে । পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ (আ.)- এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, দু'ফেরেশতার মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা দাউদ (আ.)- এর নিকট এসেছিলেন, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য, তাহলে ঐ ফেরেশতাদের মধ্যে কে সত্যের উপর ছিলেন?

ইয়াহিয়া বলল : উভয়েই সত্যের উপর ছিলেন এবং পরস্পর কোন বিরোধ ছিলনা । আর তাদের বিতর্ক ছিল সাজানো এবং চেয়েছিল এর মাধ্যমে দাউদ (আ.)- কে তাঁর দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে ।[৭২]

হিশাম বললেন : আলী (আ.) ও আব্বাসের মধ্যেকার বিতর্কও এরূপই ছিল, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিলনা । কেবলমাত্র আবু বকরকে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে এ কাজ করেছিলেন । তাঁরা আবু বকরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, তুমি যে বল নবী (সা.)- এর সম্পদের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না, এটা মিথ্যা এবং আমরা তার উত্তরাধিকারী ।

ইয়াহিয়া হতবাক হয়ে গেল এবং কোন জবাব দেয়ার ক্ষমতা তার থাকল না এবং হারুন হিশামকে প্রশংসা করল ।[৭৩]

ইউনুস ইবনে ইয়াকুব বলেন : ইমাম সাদিকের একদল সাহাবী যেমন : হোমরান ইবনে আইয়ান, মুমিন তা'ক, হিশাম ইবনে সালিম, তাইয়্যার ও হিশাম ইবনে হাকাম তার নিকট উপস্থিত ছিলেন । হিশাম ছিলেন যুবক । ইমাম হিশামকে বললেন : বলবেনা, আমর ইবনে উবাইদের সাথে কী করেছ, কিরূপে তাকে প্রশ্ন করেছ?

হিশাম বললেন : আপনার সম্মুখে আমি লজ্জা করি এবং আপনার উপস্থিতিতে আমি ভাষা খুঁজে পাই না ।

ইমাম বললেন : যখন তোমাকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকি তখন তুমি কি তা কর?

হিশাম বললেন : শুনেছিলাম যে, আমর ইবনে ওবাইদ বসরার মসজিদে মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখে আর এটা আমার জন্য খুব গুরুত্ববহ ছিল । জুমা'র দিবসে বসরায় প্রবেশ করলাম এবং মসজিদে গেলাম; দেখলাম আমর ইবনে ওবাইদ মসজিদে বসে ও লোকজন তাকে ঘিরে বসে আছে এবং কোন কিছু সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করছে । লোকের ভিড় ঠেলে গিয়ে তার নিকট বসলাম এবং বললাম, হে বিদ্বান, আমি একজন আগুন্তুক, আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দাও! আমাকে অনুমতি দিল । আমি বললাম : তোমার চোখ আছে কি? বলল : ওহে বৎস, কেমন প্রশ্ন? বললাম : আমার প্রশ্ন এরূপই হবে । বলল : জিজ্ঞাসা কর, যদিও তোমার প্রশ্ন নির্বোধের মত । পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার চোখ আছে কি?

বলল : হ্যাঁ, আছে ।

বললাম : তা দিয়ে কী দেখ?

বলল : রং সমূহ এবং আকৃতি সমূহ ।

বললাম : তোমার নাক আছে কি?

বলল : হ্যাঁ, আছে ।

বললাম : তা দিয়ে কী কর?

বলল : বিভিন্ন গন্ধ গ্রহণ করি ।

বললাম : মুখ আছে কি?

বলল : হ্যাঁ, আছে ।

বললাম : তা দিয়ে কী কর?

বলল : খাবারের স্বাদ আস্বাদন করি ।

বললাম : তোমার মস্তিস্ক ও অনুভূতি কেন্দ্রও আছে কি?

বলল : হ্যাঁ, আছে ।

বললাম : তা দিয়ে কী কর?

বলল : তা দিয়ে আমার অনুভূতিতে যা কিছু বিদ্যমান সেগুলোকে স্বতন্ত্র ভাবে উপলব্ধি করি ।

বললাম : এ অনুভূতি তোমাকে তোমার অনুভূতি কেন্দ্রের অভাব মুক্ত করে কি?

বলল : না

বললাম : কিরূপে? অথচ তোমার দেহের সকল অঙ্গ ও অনুভূতি সঠিক রূপে বিদ্যমান!

বলল : যখনই এ অনুভূতি কোন কিছু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তখন মস্তিষ্কের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাতে তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে বিশ্বাস অর্জিত হয় ।

বললাম : তাহলে মহান আল্লাহ অনুভূতির সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য মস্তিস্ক ও অনুভূতি কেন্দ্র দিয়েছেন ।

বলল : হ্যাঁ, তাই ।

বললাম : সুতরাং মস্তিস্ক ও অনুভূতি কেন্দ্র আমাদের জন্য অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজন ।

বলল : হ্যাঁ, তাই ।

হিশাম বললেন : মহান আল্লাহ্ তোমার ইন্দ্রিয়কে ইমাম (বা পরিচালক) বিহীন সৃষ্টি করেনি; যা সঠিক বিষয়কে, সঠিক নয় এমন বিষয় থেকে স্বতন্ত্র করে । তবে, এ সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান এতসকল বৈসাদৃশ্য, দ্বিধা- দ্ব ও মতবিরোধের উপস্থিতিতে ইমামবিহীন সৃষ্টি করবে (যে বিরোধ, দ্বিধার সময় অন্যরা তার শরণাপন্ন হবে) কি করে ভাবলে?! !

আমর ইবনে উবাইদ নিশ্চুপ রইল এবং কিছুই বলল না । অতঃপর আমার দিকে তাকাল এবং বলল : তুমি কোথাকার অধিবাসী?

বললাম : কুফা ।

বলল : তুমি কি হিশাম? সে আমাকে নিজের নিকট বসাল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ না করেছি, সে কোন কথা বলেনি । ইমাম সাদেক (আ.) স্মিত হাসলেন এবং বললেন : তোমাকে এ যুক্তি কে শিখিয়েছে?

হিশাম বললেন : ওহে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, আমার মুখ দিয়ে এমনিই বের হয়েছে ।

ইমাম বললেন : ওহে হিশাম! আল্লাহর শপথ এ যুক্তি ইবরাহীম ও মুসা (আ.)- এর সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে ।[৭৪]

তথ্যসূত্র :

১। যা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত।

২। কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬।

৩। উমাইয়্যা বিরোধী বিপ্লবের দাবীদাররা প্রকৃতপক্ষে এ ঘৃণ্য প্রতারণা করেছিল। অর্থাৎ তারা আব্বাসীদেরকে উমাইয়্যাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং খেলাফতকে তার প্রকৃত কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করতে বাঁধ সাধল। আবু সালামাহ ও আবু মুসলিম খোরাসানী লোকজনকে সর্বপ্রথমে হযরত আলীর বংশধরগণের দিকে আহবান করেছিল। কিন্তু পর্দার আড়ালে তারা আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের প্রাসাদ রচনা করেছিল। আর তাই হযরত ইমাম সাদেক (আ.) রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হেতু তাদের কথা বার্তার প্রতি ক্ষেপ করেননি। কারণ, তিনি জানতেন, তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য সংগ্রাম করছে না এবং তাদের মাথায় অন্য পরিকল্পনা বিদ্যমান। দ্রষ্টব্য : মিলাল ওয়াল নিহাল, শাহরেস্তানী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪ মিশর থেকে মুদ্রিত, তারিখে ইয়াকুবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯, বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১৪২।

৪। বিহার খঃ ৪৮ পৃঃ ৭১, ৭২ এছাড়া এলামূল ওয়ারা তাবারী , প্রকাশনায় ইলমিয়া ইসলামীয়া পৃঃ ২৯৫ দ্রষ্টব্য।

৫। সূরা মুহাম্মদ : ২২

৬। তারিখে বাগদাদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩০- ৩১

৭। মাকাতিলুত তালিবিয়ীন, পৃ. ৪৪৭

৮। মাকাতিলুত তালিবিয়ীন, মিশর থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২৫৩।

৯। তারিখে তাবারি, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৯২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।

১১। হায়াতুল ইমাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

১২। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭, বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

১৩। তারিখে তাবারি, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬০৩।

১৪। হায়াতুল ইমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৮। আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ্, ২য় খণ্ড।

১৯। হায়াতুল ইমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২- ৭৭।

২২। মাকাতিলুত তালিবিয়ীন, পৃ. ৪৬৩- ৪৯৭।

২৩। আমালীয়ে শেখ তুসী, পৃ. ২০৬।

২৪। প্রাগুক্ত

২৫। রেজালে কাশী, পৃ. ৪৪০- ৪৪১, হযরতের পিতা ইমাম সাদেক (আ.) ও ইউনুস ইবনে ইয়াকুবকে বলেছেন : এদেরকে এমনকি মসজিদ নির্মানের ক্ষেত্রেও সাহায্য করোনা। ওয়াসায়েল, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১২০- ১৩০।

২৬। গাইবাত, শেখ তুসী, পৃ. ২১।

২৭। তারিখে বাগদাদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩২।

২৮। গাইবাত, শেখ তুসী, পৃ. ২২- ৯৭।

২৯। উয়ুনু আখবারুর রেজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

৩০। কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬, আনবারুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ৯৭।

৩১। উয়ুনু আখবারুর রেযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১, ইহতিজাজে তাবারসী, পৃ. ২১১- ২১৩, বিহারুল আনওয়ার, ৪৮তম খণ্ড, পৃ. ১২৫- ১২৯।

৩২। হায়াতুল ইমাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০, এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৮১ (কিছুটা পার্থক্য সহ)।

৩৩। হায়াতুল ইমাম মুসা ইবনে জাফর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০, এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৮১ (কিছুটা পার্থক্য সহ)।

৩৪। মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

৩৫। এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৭৭।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৩৭। এ কর্মটি যেহেতু ঐ ব্যক্তির সংশোধনের জন্য ও হেদায়াতের জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে; সেহেতু ইমামের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র এটা বৈধই ছিল না, বরং জরুরী ছিল।

৩৮। বাগদাদের ইতিহাস, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮; এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৭৮

৩৯। তারিখে বাগদাদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৪১। ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬ (পুরনো সংস্করণ)।

৪২। তোহাফুল উকুল ।

৪৩। মোস্তাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪৫। অয়িনে বান্দেগী, পৃ. ১৩১।

৪৬। বিহারুল আনওয়ার, ৪৮তম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৪৮। এলামুল ওয়ারা তাবরিসী, পৃ. ২৯১; ইসবাতুল হুদাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৪৯। বাসায়েরুদ্দারাজাত, পৃ. ৪৭১, নতুন সংস্করণ; ইসবাতুল হুদাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।

৫০। গায়বাত, নো'মানী, পৃ. ১৭৯; বিহারুল আনওয়ার, ৪৮তম খণ্ড, পৃ. ২১

৫১। এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৭০

৫২। ইমাম সাদিক (আ.) ১৪৮ হিজরীতে এবং ইমাম কাযেম (আ.) ১৮৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন।

৫৩। মুনতাহাল মাকাল, পৃ. ২৫৪।

৫৪। রেজালে কাশী, পৃ. ৫৯১।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০ ।

৫৬। আল ইখতিসাস, শেখ মুফিদ পৃঃ ৮৬।

৫৭। রেজালে কাশি পৃঃ ৪৪০- ৪৪১।

৫৮। ফেহেরেস্তে শেখ তুসী , পৃ. ১০৯ নাজাফ থেকে প্রকাশিত ১৩৮০ সৌরবর্ষ।

৫৯। ফেহেরেস্তে নাজ্জাসী, পৃ. ১৪৮ তেহরান থেকে প্রকাশিত।

৬০। রেজালে কাশী , পৃ. ৫০২।

৬১। রেজালে কাশী , পৃ. ৫০৩।

৬২। ফেহরেস্তে শেখ তুসী, পৃ. ১১৭।

৬৩। কাফি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১০।

৬৪। কোরবুল আসনাদ, পৃ. ১২৬।

৬৫। রেজালে কাশী, পৃ. ৪৩৩।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

৬৭। এরশাদ, মুফিদ, পৃ. ২৭৫।

৬৮। রেজালে কাশী, পৃ. ৪৩০।

৬৯। ফেহরেস্তে শেখ তুসী, পৃ. ১১৭।

৭০। রেজালে কাশী, পৃ. ১৮৬।

৭১। ফেহরেস্তে ইবনে নাদিম, পৃ. ২৬৩।

৭২। দাউদ ও দু'ফেরেশতার কাহিনী সূরা ছোয়াদের ২১- ২৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এ আয়াতসমূহের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৭৩। আল ফুসূলুল মোখতারাহ, সাইয়্যেদ মুরতাজা, পৃ. ২৬।

৭৪। রেজালে কাশী, পৃ. ২৭১- ২৭৩, উসুলে কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬, মাসউদী তার মুরুজুয যাহাব গ্রন্থে কিছুটা বেশী পার্থক্য সহ বর্ণনা করেছেন কিন্তু এ পার্থক্য আমাদের উদ্দিষ্ট দলিলের কোন ক্ষতি হয়নি ।

সূচীপত্র

ভূমিকা 1

ইমাম ও আব্বাসীয় শাসন 6

ফাখের মর্মন্তুদ ঘটনা 11

ইমামের ভূমিকা 14

তত্ত্বীয় ও জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ও কথোপকথন 19

ইমামের ইবাদত 24

ইমামের মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা ও নম্রতা 26

ইমামের বদান্যতা ও দানশীলতা 28

ইমামের বক্তব্য 30

ইমামের ইমামত সম্পর্কে আলোচনা 31

ইমামের প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রা ছাত্রগণ 34

তথ্যসূত্র : 44